বিশিষ্ট ব্যক্তির দিনলিপির উদাহরণ

১. একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

১ মার্চ, সোমবার, ১৯৭১

আজ বিকেলে রুমী ক্রিকেট খেলা দেখে তার বন্ধুদের বাসায় নিয়ে আসবে হ্যামবার্গার খাওয়ানোর জন্য।

গোসল সেরে বারোটার দিকে বেরোলাম জিন্না এভিনিউয়ের পূর্ণিমা স্ন্যাকবার থেকে ডিনার-রোল কিনে আনার জন্য।

দু'ডজন ডিনার-রোল কিনে সোজা চলে এলাম বাড়ির কাছের নিউ মার্কেটে। গত দুই সপ্তাহ ধরে প্রায়ই বিভিন্ন দোকানে খোঁজ করি পূর্ব পাকিস্তানের তৈরি সাবান, তেল, টুথপেস্ট, বাসন-মাজা পাউডার; কিন্তু পাই না। একমাত্র ইভা বাসন-মাজা পাউডারটাই এখানকার তৈরি– বলা যেতে পারে সবে ধন নীলমণি। পিয়া নামের এক ঢাকাই টুথপেস্ট বাজারে বের হবো–হবো করে এখনও বের হতে পারছে না, আল্লাই মালুম কী কঠিন বাধার জন্য!

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেড়টা। দরজা খুলে দিয়েই বারেক জানাল: 'সাবরে ফুন করেন আম্মা। খাবার-দাবার কিন্যা রাখতে কইছে। কই জানি গুন্ডগোল লাগছে।'

গন্ডগোল? তা লাগাতেই পারে। গত দু'মাস থেকেই তো ঢাকা তপ্ত কড়াই হয়ে রয়েছে। অফিসে ফোন করতেই শরীফ জানাল: 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেলা একটার সময় রেডিওতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শহরে সব জায়গায় হৈচৈ পড়ে গেছে। লোকেরা দলে দলে অফিস-আদালত ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানকার সব দর্শক শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এখানে মতিঝিলে তো দারুণ হৈচৈ হচ্ছে চারদিকে। কেন, নিউ মার্কেটের দিকে কিছু দেখনি?

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'ঐ সময়টা আমি পেছন দিকের দোকানগুলোয় ছিলাম, ঠিক খেয়াল করিনি। ওখানকার লোকেরা হয়তো এখনো শুনে ওঠেনি।' তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'রুমী–জামী যে স্টেডিয়ামে!'

শরীফ বলল, 'চিন্তা করো না। ওরা বেরিয়েই আমার অফিসে এসেছিল। জামীকে এখানে রেখে রুমী ওর বন্ধুদের কাছে গেছে। শোনো, বেশ গোলমাল হবে। এখানে অল-রেডি মিছিল বেরিয়ে গেছে। বায়তুল মোকাররম, স্টেডিয়ামের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, খবর পেলাম। গোলমাল বাড়লে কারফিউ দিয়ে দিতে পারে। ঘরে খাবার-দাবার আছে কিছু? না থাকলে এক্ষুণি কিনে রাখ।'

তক্ষুণি আবার বেরোলাম। এলিফ্যান্ট রোডে উঠতেই দেখি– দু'পাশের ছোটো ছোটো দোকানগুলোতে লোকজনের অস্বাভাবিক ভিড়। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে কেনাকাটা করছে। দোকানিরা দিয়ে সারতে পারছে না। আমিও দুতিনটে দোকান ঘুরে, ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করে, টোস্ট বিস্কুট, চানাচুর, দেশলাই, মোমবাতি, গুঁড়োদুধ, ব্যাটারি এসব কিনলাম। বাড়িতে এসেই বারেকের হাতে খালি কেরোসিনের টিন আর সুবহানের হাতে খালি বস্তা ধরিয়ে পাঠিয়ে দিলাম কেরোসিন আর চাল কেনার জন্য।

এইসব করতে করতে শরীফ আর জামী এসে গেল অফিস থেকে। প্রায় তিনটে বাজে। টেবিলে বেড়ে রাখা খাবারের ঢাকনা তুলে খেতে বসে জিগ্যেস করলাম, 'আর খবর কি?'

'শেখ মুজিব হোটেল পূর্বাণীতে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। আসার সময় দেখি হোটেলের সামনে তিনটে রাস্তাই একেবারে মেইন রোড পর্যন্ত লোকে ঠাসা। সবার হাতে লোহার রড আর বাঁশের লাঠি। অফিস থেকে বেরিয়ে দৈনিক পাকিস্তানের দিক দিয়ে গাড়ি নিতে পারলাম না ভিড়ের চোটে। শেষে গভর্নমেন্ট হাউসের পাশের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গুলিস্তান ঘুরে এসেছি। রুমী এখনো ফেরেনি?'

এবার আমিই শান্তস্বরে বললাম, 'এই হৈচৈতে কোথাও আটকে গেছে মনে হয়। খেলার শেষে বন্ধুদের নিয়ে হ্যামবার্গার খেতে আসার কথা। এখন খেলা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, হয়ত আগেই আসবে।'

চারটে বাজল, পাঁচটা বাজল। রুমীর দেখা নেই। সাড়ে চারটের মধ্যে দুই ডজন হ্যামবার্গার বানিয়ে আভ্ন্‌য়ে মৃদু গরমে রেখে দিয়েছি। সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত এসে গেল। রুমী এলো আটটারও পরে। একা। বিকেল-সন্ধ্যে বাগানে পায়চারি করতে করতে আমার রাগ উপচে উদ্বেগ দানা বাঁধছিল মনে। রুমীকে দেখেই রাগ আবার ঝাঁপিয়ে এলো সামনে। রুমী আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দুই হাত তুলে, মুখে হৃদয়-গলানো হাসি ভাসিয়ে বলল, 'আগে শোনো তো আমার কথা। কত কী যে ঘটে গেল একবেলায়। সবকিছুর স্কুপ-নিউজ এখুনি দিতে পারি তোমায়। নাকি, কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে খবরের কাগজের জন্য?

আমি হাসি চেপে ভ্রূকুটি বজায় রেখে বললাম, 'কি তোমার স্কুপ-নিউজ, শুনি?'

'অনেক, অনেক। একেবারে গোড়া থেকে বলি। একটার সময় স্টেডিয়ামে ছিলাম। অনেক দর্শকই সঙ্গে রেডিও নিয়ে গিয়েছিল। অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা যেই না কানে যাওয়া, অমনি কি যে শোরগোল লেগে গেল চারদিকে। মাঠভর্তি চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক– সবাই জয়বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। আমি জামীকে আব্বুর অফিসে রেখে ছুটলাম ইউনিভার্সিটিতে। ওখানেও একই ঘটনা। রেডিও'র ঘোষণা শোনামাত্রই ছেলেরা সবাই দলে দলে ক্লাস থেকে, হল থেকে বেরিয়ে বটতলায় জড়ো হতে শুরু করেছে। আমি যখন পৌঁছলাম, তখনো ছেলেরা পিলপিল করে আসছে চারদিক থেকে। মনে হয়, সমুদ্রের একেকটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বটতলায়। তখুনি ছাত্রলীগ আর ডাকসুর নেতারা ঠিক করল বিকেল তিনটেয় পল্টন ময়দানে মিটিং করতে হবে।'

'পল্টনে মিটিং হলো? দেড়টা-দুটোয় বলল আর তিনটেয় মিটিং হলো?'

'হলো মানে? সে তুমি না দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না আম্মা। এ্যা–তো লোক! এ্যাতো লো–ক! উঃ আল্লারে। কিন্তু মিটিংয়েরও আগে তো পূর্বাণীতে শেখ মুজিব প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন। উনি অবশ্য সকাল থেকেই ওখানে ওঁদের দলের পার্লামেন্টারি বৈঠকে ছিলেন। ইয়াহিয়ার ঘোষণার এক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট হাজার লোক বাঁশের লাঠি আর লোহার রড ঘাড়ে নিয়ে পূর্বাণীর সামনে সবগুলো রাস্তা জ্যাম করে ফেলল। সেকি শ্লোগান। পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ আর জিন্নার ছবিও পুড়িয়েছে। শেখ তক্ষুণি সাংবাদিকদের ডেকে ঘোষণা দিলেন হরতালের আর ৭ মার্চ রেসকোর্সে মিটিংয়ের।'

মনটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছে। শরীফও বলেছে পূর্বাণীর সামনে ভিড়ের কথা। তবুও মুখের বেজার ভাবটা বজায় রেখে বললাম, 'এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দু'ডজন হ্যামবার্গার ঠিকই বানালাম। কিন্তু তোদের কারো মনে নেই সে কথা।'

'মনে থাকার যো আছে আম্মা? কী যে খই ফুটছে সারা শহরে! গুলিস্তানের মোড়ে কামানের ওপর দাঁড়িয়ে মতিয়া চৌধুরী যা একখানা আগুন ঝরানো বক্তৃতা দিলেন না, শুনলে তোমারও গায়ে হলকা লাগত। সাধে কি আর ওঁকে সবাই অগ্নিকন্যা বলে।'

আমি আবার ক্ষেপে উঠলাম। 'এইবার গুল মারছিস। তুই একা এতোগুলো জায়গায় এক বিকেলে গেলি কেমন করে?'

রুমী খুব বেশি রকম অবাক হয়ে বলল, 'খুবই সিম্পল। বন্ধুর হোন্ডার পেছনে চড়ে সবখানে টহল দিয়েছি। আমরা কি এক জায়গায় বসে নেতাদের বক্তৃতা শুনেছি নাকি? স্টেডিয়াম থেকে ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে পূর্বাণী, পূর্বাণী থেকে গুলিস্তান মোড়ের কামান, সেখান থেকে পল্টন– এমনি করে চরকিঘোরা ঘুরেছি না?'

'সারাদিন খাওয়া হয়নি নিশ্চয়?'

'কেই-বা খেয়েছে? একটার আগে যে যা খেয়েছে চা-বিস্কুট-ব্যস। আর খাওয়া-দাওয়া নেই। বাঁশের লাঠি, লোহার রড– যে যা পেয়েছে, একেকখানা ঘাড়ে নিয়ে সবাই রাস্তায় নেমে গেছে। তবে এতক্ষণে টের পাচ্ছি সারাদিন খাওয়া হয়নি।'

'চল চল, আগে খেতে বস। খাওয়ার পর বাকিটা শুনব।'

'ঐ হ্যামবার্গারই দাও আমায়। নষ্ট করে কি লাভ? তোমরাও সবাই ঐ দিয়েই রাতের খাওয়া সেরে ফেল?'

'গুষ্টিসুদ্ধ খেয়েও কি সব ফুরোনো যাবে?'

'চিন্তা করো না। আমি একাই ছয়টা খেয়ে ফেলব।'

শেখ মুজিব আগামীকাল ঢাকা শহরে, আর পরশুদিন সারাদেশে হরতাল ডেকেছেন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতের ঘোষণাও দিয়েছেন। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের কি পরিণাম হতে পারে, তা নিয়ে বহু রাত পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা চলল খাবার টেবিলে বসে। রাত প্রায় বারোটার দিকে শুতে গিয়েও ঘুম এলো না। অনেক দূর থেকে শ্লোগানের শব্দ আসছে। বোঝা যাচ্ছে এত রাতেও অনেক রাস্তায় লোকেরা মিছিল করে শ্লোগান দিচ্ছে। কেবল জয় বাংলা ছাড়া অন্য শ্লোগানের কথা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু তবু ঐ সম্মিলিত শত-কণ্ঠের গর্জন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে এসে পড়ছে শ্রুতির কিনারে। শিরশির করে উঠছে সারা শরীর। গভীর রাতে আধো-ঘুমে, আধো-জাগরণে মনে হলো যেন গুলির শব্দও শুনলাম।

২৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৭১

২৩ মার্চের উজ্জ্বল প্রতিরোধ দিবসের পর কি যেন এক কালোছায়া সবাইকে ঘিরে ধরেছে। চারদিক থেকে খালি নৈরাশ্যজনক খবর শোনা যাচ্ছে। ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টোর বৈঠক যেন সমাধানের কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছে না। শেখ মুজিব প্রতিদিন ভবনে যাচ্ছেন আলোচনা করতে, বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের বলছেন আলোচনা এগোচ্ছে; ওদিকে আন্দোলনকারী জঙ্গী জনতাকে বলছেন দাবি আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যান। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন।

বেশকিছু দিন থেকে মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে প্রতিদিন নাকি প্লেনে করে সাদা পোশাকে প্রচুর সৈন্য এসে নামছে বিমানবন্দরে। বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা, তবু বুক কেঁপে ওঠে। ওদিকে চট্টগ্রাম থেকে দু'তিনজন বন্ধুর টেলিফোনে জানা গেছে– চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র বোঝাই

জাহাজ এসে ভিড়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। যে অস্ত্র চট্টগ্রামের বীর বাঙালিরা খালাস করতে দেবে না বলে মরণপণ করে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। ওদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

রুমীর মুখে দু'দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল খামছে ধরে রুমী বলল, 'আম্মা বুঝতে পারছ না মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা ওদের সময় নেবার অজুহাত মাত্র। ওরা আমাদের স্বাধীনতা দেবে না। স্বাধীনতা আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রাম করে।'

আমি শিউরে উঠলাম, 'বলিস কিরে? পাকিস্তান আর্মির আছে যুদ্ধে লেটেস্ট মডেলের সব অস্ত্রশস্ত্র। তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করবি কি দিয়ে?'

রুমী উত্তেজিত গলায় বলল, 'একজ্যাক্ট্‌লি– সেই প্রশ্ন আমারও। সাদা গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে শেখ রোজ প্রেসিডেন্ট হাউসে যাচ্ছেন আর আসছেন, আলোচনার কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। ওদিকে প্লেনে করে রোজ সাদা পোশাকে হাজার হাজার সৈন্য এসে নামছে, চট্টগ্রামে অস্ত্রভর্তি জাহাজ ভিড়ছে। আর, এদিকে ঢাকার রাস্তায় লাঠি-হাতে বীর বাঙালিরা ধেই ধেই করে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সালাম দিয়ে হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে পেট-পুরে মাছ-ভাত খেয়ে ঘুম দিচ্ছে। পল্টন ময়দানে ডামি বন্দুক ঘাড়ে কুচকাওয়াজ করছে। আমরা কি এখনো রূপকথার জগতে বাস করছি নাকি? ছেলেমানুষিরও একটা সীমা থাকা দরকার।'

'তাহলে এখন উপায়?'

'উপায় বোধহয় আর নেই আম্মা।'

ভয় আর আতঙ্কের একটা হিম বাতাস আমাকে অবশ করে দেয় যেন, 'না, না, ওরকম করে বলিস না। তুই শেখের রাজনীতির সমর্থন করিস না, তাই একথা বলছিস। তোরা হলি জঙ্গী বাঙালি, খালি মার-মার, কাট-কাট। শেখ ঠিক পথেই আন্দোলনকে চালাচ্ছেন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলেও এভাবে অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে জনগণ তাদের দাবি ঠিকই আদায় করে নেবে?'

'আম্মা, তুমি কোন আহাম্মকের স্বর্গে বসে আছ? শুধু কয়েকটা বিষয় তলিয়ে দেখ– পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে যা যা ঘটছে, সবই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিক হিসেবে এগুলো সবই বিষম রাষ্ট্রদ্রোহিতা। দেশের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্ট খোদ হাজির, অথচ দেশ চলছে শেখের কথায়। লোকে অফিস-আদালত-ব্যাঙ্ক সব চালাচ্ছে শেখের সময়ে। তারপর দেখ পাকিস্তান সরকারের হেনস্তা। টিক্কা খানকে কোনো বিচারপতি শপথ গ্রহণ করাতে রাজি হলো না বলে বেচারা গভর্নর হতে পারল না। শুধু মার্শল ল' এডমিনিস্ট্রেটার হয়ে কাজ চালাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এসে নামল আর তার বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ। সেনাবাহিনীর জন্য কোনো বাঙালি খাবার জিনিস বেচছে না। ওরা কতদিন ডাল-রুটি খেয়ে থেকেছে। তারপর প্লেনে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে খাবার আনতে হয়েছে। এতসব কাণ্ডের পরও ইয়াহিয়া সরকার একদম মুখ বুজে চুপ করে আছে। কেন ব্ঝতে পারছ না? ওরা শুধু সময় নিচ্ছে। ওরা আলোচনার নাম করে আমাদের ভুলিয়ে রাখছে। শেখ বড্ডো দেরি করে ফেলছেন। এ পথে, এভাবে আমরা বাঁচতে পারব না।'

আমি রাগ করে বললাম, 'দাড়ি কামিয়ে সাবান মেখে ঠান্ডা পানিতে ভালো করে গোসল কর দেখি বাপু– মাথা বড্ড বেশি গরম হয়ে গেছে।'

রুমী নীরবে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি কেমন যেন চুপসে গেলাম। নিজের মনেও যেন আর জোর পাচ্ছি না।

আজ আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী-দম্পতি আতিক ও বুলুর বাসায় রাতের খাবার দাওয়াত আছে। এরকম অবস্থায় দাওয়াত খেতে যেতে ইচ্ছে করে না, আবার ঘরে থাকলেও ফাঁপর লাগে। শরীফের মিটিং ছিল ঢাকা ক্লাবে। অতএব, আমি একাই গেলাম আতিকের বাসায়। সেখানে দেখা হলো এনায়েতুল্লাহ খান ও তার স্ত্রী লীনার সঙ্গে, লীনার ছোটো ভাই জিল্লুর রহমান খান ও তার আমেরিকান বউ মার্গারেটের সঙ্গে। আরো এসেছে আতিকের বন্ধু হালিম ও তার স্ত্রী মণি, আতিকের ভায়রা ভাই ফাত্তাহ ও তার স্ত্রী। সকলের মুখে একই কথা: কি হবে? কি হবে?

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নাকি কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে প্লেনে চড়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেছে? রাস্তায় নাকি ইতোমধ্যেই আর্মি নেমে গেছে? আমি বুঝতে পারছি না আর্মি কেন নামবে।

সাড়ে নয়টার সময় মাসুমা ফিরল টিভি অফিস থেকে। কিছুদিন আগে বড়ো ভাই রফিকুল ইসলামের বাসা ছেড়ে এখন মেজ ভাই আতিকুল ইসলামের বাসায় থাকছে। সে এলো ঝড়ে পড়া পাখির মতো বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে। সবার মধ্যে যে আশঙ্কা, তার মধ্যেও তাই। বরং টিভি স্টেশনে সে আমাদের চেয়ে বেশি কিছু শুনেছে। কিন্তু মাসুমা আমাদের সঙ্গে বসল না, বলল, 'খুব বেশি টায়ার্ড আমি, নিজের ঘরে যাই। অনেক বলা সত্ত্বেও সে খেল না আমাদের সঙ্গে।'

আমাদেরও খিদে ছিল না। কোনোমতে খাওয়া সারলাম সবাই। সাড়ে দশটায় শরীফ ফোন করল, 'এখনো দেরি করছ কেন? শহরের

অবস্থা ভালো নয়। বহু জায়গায় জনতা নতুন করে ব্যারিকেড দিচ্ছে। ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। অনেক রাস্তায় আর্মির গাড়ি দেখা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো।'

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসলাম। রুমী-জামী ছুটে এলো এ ঘরে। কি ব্যাপার? দু'তিন রকমের শব্দ– ভারি বোমার বুমবুম আওয়াজ, মেশিনগানের ঠাঠাঠাঠা আওয়াজ, চিঁ–ই–ই–ই করে আরেকটা শব্দ। আকাশে কি যেন জ্বলে-জ্বলে উঠছে, তার আলোয় ঘরের ভেতর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠছে। সবাই ছুটলাম ছাদে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে মাঠ পেরিয়ে ইকবাল হল, মোহসীন হল, আরো কয়েকটা হল, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্সের কয়েকটা বিল্ডিং। বেশির ভাগ আওয়াজ সেইদিক থেকে আসছে, সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের আর্তনাদ, চিৎকার। বেশিক্ষণ ছাদে দাঁড়ানো গেল না। আগুনের ফুলকির মতো কি যেন চিঁ–ই–ই–ই শব্দের সঙ্গে এদিক পানে উড়ে আসছে। রুমী হঠাৎ লাফ দিয়ে কালো আর স্বাধীন বাংলা পতাকা দুটো নামিয়ে ফেলল।

হঠাৎ মনে পড়ল একতলায় বারেক, কাসেম ওরা আছে। হুড়হুড় করে সবাই নিচে নেমে গেলাম। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে উঠানের দিকের দরজাটা খুলতেই আমাদের অ্যালসেসিয়ান কুকুর মিকি তীর বেগে ঘরে ঢুকে আমাদের সবার পায়ে লুটোপুটি খেতে খেতে করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। উঠানের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম, 'বারেক, কাসেম।' ওদের ঘরের দরজা খুলে বারেক, কাসেম কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। আমি বললাম, 'তোমরা তোমাদের বিছানা নিয়ে এ ঘরে চলে এসো।'

মিকিকে কিছুতেই আর ঘর থেকে উঠানে নামানো গেল না। এত গোলাগুলির শব্দ ও ট্রেসার হাউইয়ের নানা রঙের আলোর ঝলকানিতে সে দিশেহারা হয়ে গেছে। রুমী তার ঘাড়ে-মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ভয় নেই, মিকি ভয় নেই। তুই আমাদের সঙ্গে উপরে থাকবি।' তাকে উপরেও নেওয়া গেল না। কি এক মরণ ভয়ে ভীত হয়ে সে খালি কোণা খুঁজছে। শেষে সিঁড়ির নিচের ঘুপচি কোনটাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইল।

বসার ঘরে ফোন তুলে দেখি, ফোন ডেড। উপরে উঠে গেলাম। বাবার গলা শুনলাম। রুমী গিয়ে বাবার হাত ধরে মৃদুস্বরে তাঁকে কি কি যেন বলতে লাগল।

বাকি রাত আর ঘুম এলো না। আবার ছাদে গেলাম। দূরে দূরে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দিক থেকে গোলাগুলি, মেশিনগানের শব্দ আসছে, ট্রেসার হাউই আকাশে রংবাজি করে চলেছে– দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে সবদিকেই দূরে আগুনের স্তম্ভ ক্রমেই স্পষ্ট ও আকাশচুম্বী হয়ে উঠছে।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। রুমী, জামী নীরবে থমথমে মুখে সুতলির বাঁধন খুলে প্লাস্টিক ব্যাগ একে একে উপুড় করল কমোডে। একটু করে ফ্ল্যাশ করে, খানিক অপেক্ষা করে, আবার ঢালে, আবার ফ্ল্যাশ করে। একসঙ্গে সব মালমশলা ঢাললে কমোডের নল বন্ধ হয়ে যাবে। জামী বাসন-মাজা পাউডার দিয়ে তিন চারবার করে হামানদিস্তা দুটো মাজল আর ধুল। একবার ধুয়ে শুঁকে দেখে, আবার মাজে, আবার ধোয়।

এ কাজ সেরে রুমী মার্কস, এঙ্গেলসের বই, মাও-সে-তুংয়ের মিলিটারি রচনাবলি সব একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরল। আমরা চিন্তা করতে লাগলাম কোথায় বইগুলো লুকোনো যায়। মাটিতে পুঁততে চাইলে, বইগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। শেষে মনে পড়ল বারেকদের ঘরের পেছনে বাউন্ডারি ওয়ালের এক জায়গায় একটা কোটরমতো আছে। প্রতিবেশী হেশাম সাহেবের বাউন্ডারি ওয়ালের দরুন এই কোটরটার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বইয়ের প্যাকেটটা ফেলে দিলে লুকোনোও থাকবে, নষ্টও হবে না। ভোরের আলো অল্প একটু ফুটতেই রুমী সাবধানে গুড়ি মেরে ওখানে গিয়ে বইয়ের প্যাকেটটা রেখে দিলো। তার ওপর ফেলল কয়েকটা শুকনো নারকেলের পাতা।

২. চে গুয়েভারার ডায়েরি

এর্নেস্টো চে গুয়েভারা

০৭/১১/৬৬

আজ থেকে শুরু হলো নতুন পর্যায়। রাত্রে আমরা খাবারে উপস্থিত হলাম। পথ আমাদের ভালোই ছিল। কোচাবাম্বার পথে প্রবেশ করার পর পাচুঙ্গো এবং আমি পর্যাপ্ত ছদ্মবেশ ধারণ করলাম, প্রয়োজনীয় যোগাযোগের ব্যবস্থা করলাম এবং দুটি জিপে করে দুই ঘণ্টা পথ চললাম।

খামারের কাছে পৌঁছে আমরা থামলাম। মাত্র একটি গাড়ি এগিয়ে গেল, যাতে খামারের কাছাকাছি যে জমিদারটি থাকে তাঁর সন্দেহ

উদ্রেক না করে। সে ওজব রটাচ্ছিল যে আমাদের দল সম্ভবত কোকেন তৈরির ব্যাপারে লিপ্ত। কথাটা বিস্ময়কর শোনাতে পারে; অভিব্যক্তিহীন তুমাইনিকে বলা হয় দলের কেমিস্ট। দ্বিতীয় ট্রিপে খামারের কাছাকাছি এসে পড়লে বিগোটেস খাড়া পাহাড়ের কিনারায় জিপটিকে ফেলে রেখে পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রায় ছুটে এলো। সে সবেমাত্র আমার পরিচয় জানতে পেরেছে। আমরা আনুমানিক কুড়ি কিলোমিটার পথ হেঁটে মাঝ রাত্তিরের কিছু পরে খামারে এসে পৌঁছলাম, এখানে তিনজন পার্টি কর্মী আছে।

রিগোটেস স্পষ্ট জানাল যে, সে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি আছে, তা পার্টি যাই করুক। কিন্তু সে মন্‌জের প্রতি অনুগত; মন্‌জেকে সে শ্রদ্ধা করে এবং মনে হলো মন্‌জের কথার মূল্য সে দেয়। তার মতে রোডোলফোও ইচ্ছুক, কোকোও তাই। তবে সংগ্রাম করার জন্য পার্টিকে বুঝিয়ে রাজি করানো পয়োজন। তাকে আমি আমাদের সাহায্য করতে বললাম এবং অনুরোধ করলাম মন্‌জে এখন বুলগেরিয়া সফর করতে গেছে, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন সে পার্টিকে না জানায়। সে দু-টি অনুরোধই রাখবে জানাল।

০৮/১১/৬৬

সারাদিন আমরা কাটালাম খাঁড়ির ধারে ঘন বনাঞ্চলে, খামার বাড়ি থেকে বেশি হলে একশ মিটার দূরে। এক ধরনের গেছোহাঁসের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হলাম, যদিও এগুলো ঠোঁটের খোঁচা দেয় না, কিন্তু বড়োই বিরক্তিকর। এ পর্যন্ত আমরা যেসব ধরনের জীব ও কীটপতঙ্গের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে রয়েছে ভেড়া এবং গোরুর গায়ের এঁটেল পোকা, গেছোহাঁস, ডাঁশমাছি ও মশা। বিগোটেস তার জিপটি টেনে তুলল আরগানারাজের সাহায্যে এবং তার কাছ থেকে কয়েকটি শূকরছানা ও মুরগি কেনার প্রতিশ্রুতি দিলো। আমি ঘটনার একটা রিপোর্ট লিখতে মনস্থ করেছিলাম কিন্তু পরের সপ্তাহে দ্বিতীয় দলটি এসে পৌঁছাবার সম্ভাবনা থাকায় লেখাটা পরের সপ্তাহের জন্য মুলতুবি রাখলাম।

০৯/১১/৬৬

সারাদিন কিছু ঘটেনি। নাকাহুরাজু (আসলে একটা খাঁড়ি)। নদীপথে আমরা অনুসন্ধান-অভিযানে যাত্রা করলাম তুমাইনিকে নিয়ে, কিন্তু উৎসে পৌঁছাতে পারলাম না। এই নদী এমন খাড়া ঢালু অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে যে, সেখানে মানুষের যাতায়াত নেই বললেই চলে। যথেষ্ট সহনশীলতা থাকলেই এখানে বেশি দিন থাকা যায়। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য ঘন বন থেকে বেরিয়ে বাড়িতে চলে আসতে হলো আমাদের। আমার শরীর থেকে ছয়টি গোরু বা ভেড়ার এঁটেলপোকা ছাড়ালাম।

১০/১১/৬৬

পাচুঙ্গো এবং পমবো বলিভিয়ান কমরেড সেরফিনকে নিয়ে অনুসন্ধান-অভিযানে গিয়েছিল। তারা আমাদের চেয়েও বেশিদূরে গিয়েছিল। তারা খাঁড়িটি (এবং একটি স্রোতস্বতী) যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সে পর্যন্ত পৌঁছেছিল, এটা ভালো কাজই হলো। ফিরবার পর তারা বাড়িতে থেকে ভবঘুরের মতো চলাফেরা করেছে এবং আরগানারাজের ড্রাইভার তাদের দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে এনেছিল। তাদের সঙ্গে কিছু কেনাকাটা জিনিসও ছিল। তাদের আমি কঠোর তিরস্কার করলাম এবং আমরা স্থির করলাম পরের দিন সকালে বনের ভিতরে চলে যাব এবং সেখানেই স্থায়ী শিবির করব। কেবল তুমাইনি বাইরে দেখা দেবে, কারণ সে খামারের কর্মচারীদের একজন বলেই পরিচিত। এতেও চলবে না, খোঁজ করে দেখা প্রয়োজন তারা আমাদের আরও লোক আনতে দেবে কি না, অন্তত আমাদের নিজেদের লোক। যাদের নিয়ে আমি অনেক বেশি সহজবোধ করব।

১১/১১/৬৬

সেই বাড়ির বিপরীত দিকে নতুন শিবিরে ঘটনাহীন দিন কাটল। এখানে আমরা ঘুমালাম। সাংঘাতিক পোকার কামড়ে অতিষ্ট হয়ে ঝুলন্ত বিছানায় মশারির নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম (মশারি কেবল আমারই ছিল)। তুমাইনি গিয়েছিল আরগানারাজের সঙ্গে দেখা করতে, তার কাছ থেকে মুরগি এবং টার্কির মতো কিছু কিছু জিনিস কিনে এনেছিল। মনে হচ্ছে তার দিক থেকে এখনো বড়ো কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি।

আরও একটা ঘটনাহীন দিন। আমরা অল্প সময়ের জন্য বের হলাম যেখানে আমাদের ক্যাম্প হবে সেই জায়গাটা তৈরি করবার জন্য। আরও ছয়জন এসে পৌঁছালে ক্যাম্প হবে। যে জায়গাটা বাছাই করা হয়েছে তা একটি টিবির ওপর। কবরস্থান থেকে প্রায় একশত মিটার দূরে। কাছাকাছি এমন ফাঁপা জায়গা আছে, যেখানে কতকগুলো গর্ত খুঁড়ে রসদ এবং অন্যান্য জিনিস গুদামজাত করা যেতে পারে। এখানে আসবার পথ থাকা উচিত। আসছে সপ্তাহের শেষ দিকে তাদের খামারে পৌঁছাবার কথা। আমার বিরল কেশগুলো বড়ো হচ্ছে, পাকাচুলগুলো সোনালি হয়ে উঠছে এবং পড়তে শুরু করেছে। আমার দাড়ি বাড়ছে। মাস দুয়েকের মধ্যে আবার আমি স্বমূর্তিতে ফিরে আসব।

১৩/১১/৬৬

রবিবার। একদল শিকারি– আরগানারাজের খামারের মজুদ– আমাদের আস্তানার পাশ দিয়ে চলে গেল। ওরা বনাঞ্চলের অধিবাসী, সরল যুবক এবং মালিকের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা পোষণ করে। দলে টানার পক্ষে ওরা খুবই উপযুক্ত। তারা আমাদের জানিয়ে গেল যে, নদীর আট

লীগ (এক লীগ সমান সাড়ে তিন মাইল) উজানে গেলে বাড়িঘর মিলবে। কয়েকটি গভীর এবং সংকীর্ণ গিরি-খাতে জলও আছে। এছাড়া আর কোনো খবর নেই।

১৪/১১/৬৬

ক্যাম্পে এক সপ্তাহ কাটালাম। পাচুঙ্গোকে দেখে মনে হচ্ছে সে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না এবং তাকে বিষণ্ন মনে হচ্ছে। তাকে এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতেই হবে। আজ আমরা একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শুরু করলাম। যাতে যা নিয়ে বিপদে পড়তে হতে পারে তার সবকিছু রাখা যাবে। এটি সম্ভবত আর্দ্রতার প্রতিরোধকও হবে। লোহার লম্বা শিক দিয়ে একে ঢেকে রেখে শত্রুর চোখে ধুলা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। দেড় মিটার গভীর কূপের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের কাজও ভালোভাবে চলছে।

[এর্নেস্টো চে গুয়েভারা (১৪ জুন ১৯২৮–৯ অক্টোবর ১৯৬৭) কিউবান বিপ্লবী ও বলিভিয়ায় গেরিলা বহিনীর সংগঠক। তাঁর গেরিলা জীবনের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করে গেছেন ডায়েরিতে, যেখানে ফুটে উঠেছে বিপ্লবের শিক্ষামূলক ও মানবিক দিক। সারা পৃথিবীতে চে তাঁর কর্ম ও জীবন নিপীড়িত এবং শোষিত মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক রূপে পরিচিত।]

৩. দিনলিপি ও আমার শিল্পী জীবনের কথা

আব্বাসউদ্দীন আহমদ (১৯৫৮ – ৫৯ সালে লেখা)

১ জানুয়ারি

নববর্ষের প্রথম দিন।

খোন্দকার মহ. ইলিয়াস তাঁর লেখা বইখানা ভাসানী যখন ইউরোপে আজ আমাকে এক কপি উপহার দিয়ে গেলেন। বই তো বহুদিন হলো আত্মপ্রকাশ করেছে– এতোদিন তো বই দেওয়ার কথা মনে পড়েনি। ... যাক, ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করলাম।

গায়করা দুপুরে এসেছিল, ভেটকাও দুপুরে এসেছিল। খায়রুল কবির সাহেবের চিঠি পেলাম।

২ জানুয়ারি

গায়করা এসেছিল। জানতে পারলাম, জসীমউদ্‌দীনের এক বছরের জন্য চাকরিতে এক্সটেনশন হয়েছে। রোজী আর ভেটকা এসেছে। কবি আজিজুর রহমান এসেছিলেন। বরকতউল্লাহ সাহেব এসেছিলেন। জাস্টিস ইব্রাহীম সাহেবের স্ত্রী এসেছিলেন সন্ধ্যায়। এশতেহাক সুফিয়ার ছেলে হয়েছে– এই খবর নিয়ে এসেছেন। কী স্ফূর্তি ভদমহিলার! খুবই আনন্দ হলো শুনে! ঠিক সেই সময় মেজর ইফতেখার তার স্ত্রীকে নিয়ে এলো। ... বাসা বেশ গুলজার। তবু তুলু-মীর্না বাসায় নেই। তারা ইউএসআই-এ গান শুনতে গেছে।

৬ মার্চ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হয়েছে সাড়ে দশটায়। সারা দিনে পাকিস্তান ১৪৫ রান করে সবাই আউট হয়ে গেল। আজ খেলার জন্য অফিস বন্ধ। সন্ধ্যায় ছোটো বিয়াই-বিয়াইন এসেছিল। রাত দশটায় ইয়াকুব মিঞা এবং গোপীবাবু এলেন। রাত দুইটা পর্যন্ত জমিজমা এক্সচেঞ্জের ব্যাপারে আলাপ করি। ... দুলুবাবাকে আজ একখানা চিঠি লিখেছি। খালেক এসেছে রংপুর থেকে পীর সাহেব ও খালেক ড্রয়িংরুমে, আমার ঘরে ইয়াকুব মিঞা ও গোপীবাবু।

১০ এপ্রিল

আজ ঈদের দিন।

সকাল সোয়া সাতটায় মীর্না মার ঈদের গান বাজল। তার আগে তুলুর রেকর্ড করা গান করাচির রেডিওতে। ভোর থেকে তুলু আমার রেকর্ড সমানে বাজিয়ে চলেছে। দোস্তরা নামাজ পড়তে গেল। দোস্তাইন, আলেয়া, মীর্না নামাজ পড়ে এলো। ভেটকা, বাবলা এসে দোস্তাইনকে নিয়ে গেল ওদের বাসায়। নামাজ শেষে কাজী দীন মুহাম্মদ, পুতুলের বাবা আনিস, ওজাজের বাবা মকবুল, তার বউ, মোনা, ওর বউ, পুতুল, রফিক, রোজী, লাজু, লিপি এলো। এলো ঝরনা ও ওর খালাতো দু ভাইবোন। তরীকুলের বড়ো ভাই, ছোটো ভাই, ওদের ভাগ্নি বীরু– এরা এলো। ভেটকা, বউমা, বাবলা, পিপি– এরা বিকেলে এলো। আমিনুল ইসলাম আর বউমা এলো চারটায়। আনিস-বউমা আর ওর দাদি এলো ছটায়। মীর্না মার কালামে ইকবাল গজলটি রেডিওতে বাজল। সন্ধ্যার পর বাগানে এসেছে সবাই। নাজির আহমেদ, ফতেহ লোহানী, আহাদ এলো। সাবের রেজা করিম, গোলাম মোস্তফা (মফিজ মন্ত্রীর ছেলে), হাশেম, দিলারা হাশেম, জয়নুল আবেদীন সাহেব (ডিজি), তাঁর স্ত্রী হোসনে আরা, ওঁর মেয়ে, মোদাব্বেরের ছেলেমেয়ে, কবি গোলাম মোস্তফা, মকু, ওর বউ, মামাতো বোন, বাবলার বোনেরা, পুতুল, তার এক বন্ধু, তুলুর বন্ধুরাও এসেছিল।

১৫ এপ্রিল

পয়লা বৈশাখ

বাঙালির নববর্ষ। ... সারা বছরের আশা–আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই দিনটিতে বাঙালিমাত্রই ভালোভাবে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। সন্ধ্যায় আরম্ভ হয় মহাজনদের শুভ হালখাতা। ... গঞ্জে–গঞ্জে, বন্দরে–বন্দরে হালখাতার মহোৎসবে গ্রামবাসী, নগরবাসী মেতে ওঠে। কোথাও শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান–গান, নাচ, বাজনা, থিয়েটার, যাত্রা। ... এই দিনটি অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের সন্ধ্যাটি আমি আমার

গৃহপ্রাঙ্গণকে গানবাজনায় মুখর করে তুলে আসছি বহুদিন থেকে।

এবার তুলু, মীর্নাই শিল্পী-সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করেছে। সন্ধ্যা সাতটায় আমার বাইরের ছোট্ট বাগানটি ভরে উঠল সুধীজনের আগমনে। কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী করা হলো। গায়ক গোলাম মোস্তফা উদ্বোধনী সংগীত গাইল। এরপর সামসুদ্দোহার গান, কবি আজিজুর রহমানের কবিতা আবৃত্তি, সোহরাব-বেদারের নজরুলগীতি, আনোয়ারের মেয়ে বাবলির নৃত্য, তুলুর ভাওয়াইয়া, মীর্নার আধুনিক বাংলা গান, জাহানারার খেয়াল গান, সমর দাশের গিটার, সবশেষে তুলু-মীর্নার দ্বৈত খেয়াল সংগীতানুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ... প্রায় দুই শ গুণী-জ্ঞানীর সমাবেশ হয়েছিল। আজিজুল হক সাহেব, কবি গোলাম মোস্তফা, শিল্পী জয়নুল আবেদিন, সাবের রেজা করিম, আবদুল মজিদ মোল্লা, হাফিজুর রহমান, কবি জসীমউদ্‌দীন ও তদীয় পত্নী, কবি গোলাম মোস্তফাপত্নী ও তাঁর মেয়ে জ্যোৎস্না ... তার মেয়েরা, আনোয়ারের বউ, ডা. শামসুন্নাহার, মাহফুজ মোদাব্বের, তাঁর স্ত্রী, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ডা. মিসেস ইব্রাহীম, তরীকুল আলম, তার মা, বড়ো জামান, ছোটো জামান, তাদের বউ– সবাই এসেছিল। রাত এগারোটা পর্যন্ত ছিল।

৪. আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি

আনা ফ্রাঙ্ক

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৯, ১৯৭২

আদরের কিটি

এইভাবে অবিরল বর্ষণের মধ্যে বাবা, মা আর আমি হেঁটে চললাম; আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে স্কুলব্যাগ আর বাজারের থলি, তার মধ্যে ঠেসে-ঠুসে ভর্তি করা রাজ্যের জিনিস।

যেসব লোক কাজে যাচ্ছিল, তারা সহানুভূতির চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তাদের গাড়িতে তারা আমাদের নিয়ে যেতে পারছে না বলে তারা বেশ দুঃখিত; ক্যাটকেটে হলদে তারাই এর জন্য দায়ী।

যখন আমরা বড়ো রাস্তায় এসে পড়লাম, কেবল তখনই মা-মণি আর বাপি একটু একটু করে গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে ভাঙলেন। বেশ কয়েক মাস ধরে আমাদের মালপত্র এবং নিত্যব্যবহার্য যাবতীয় জিনিস যথাসম্ভব সরিয়ে ফেলা হয়েছে; অজ্ঞাতবাসের সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে নিজে থেকে আমাদের চলে যাওয়ার কথা ছিল জুলাই ১৬ তারিখে। হঠাৎ শমন আসায় দশদিন আগেই আমাদের চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে; ফলে যেখানে যাচ্ছি সেখানে তেমন পরিপাটি ব্যবস্থা করা যায়নি, কিন্তু তারই মধ্যে যতটা সম্ভব মানিয়ে গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে, যে বাড়িতে বাপির আপিস, সেখানেই আমাদের গোপন ডেরা। বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা শক্ত হবে; যাই হোক, পরে আমি সেটা বুঝিয়ে বলব। বাপির যে কারবার তাতে কর্মচারী খুব বেশি ছিল না। মিস্টার ক্রালার, কুপহুইস, মিপ্ আর তেইশ বছর বয়সের টাইপিস্ট এলি ফসেন– শুধু এঁরাই আমাদের আসবার কথা জানতেন। এলির বাবা মিস্টার ফসেন আর দুটি ছোকরা কাজ করত মালগুদামে– তাদের সেকথা জানানো হয়নি।

বাড়িটার চেহারা কী রকম বলছি: একতলায় একটা খুব বড়ো গুদামঘর, সেখানে মালপত্র রাখা হয়। বাড়ির সদরদরজাটা গুদামঘরের দরজার ঠিক পাশেই এবং সদরদরজার প্রবেশপথে আরও একটি দরজা– সেখান থেকে উঠে গেছে সিঁড়ি (ক)। সিঁড়ির মাথায় ঘষা কাচ লাগানো আরেকটি দরজা, তাতে কালো কালিতে আড়াআড়ি ভাবে লেখা 'আপিসঘর'। সেটাই হলো সদর দপ্তর, খুব বড়ো, খুব খোলামেলা এবং খুব গমগমে। এরি, মিপ্ আর মিস্টার কুপহুইস দিনমানে সেখানে কাজ করেন। একটা ছোটো এঁদো ঘরে সিন্দুক, গা-আলমারি, একটা বড়ো কাবার্ড; সেই ঘর পেরিয়ে ছোটো অন্ধকারমতো আরেকটি আপিসঘর। আগে এখানে বসতেন মিস্টার ক্রালার আর মিস্টার ফান ডান– এখন মিস্টার ক্রালার বসেন একা। দালানটা দিয়ে সোজা মিস্টার ক্রালারের আপিসঘরে যাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্র যে কাচের দরজাটা দিয়ে যেতে হয়, সেটা বাইরে থেকে সহজে খোলা যায় না– খুলতে হয় ভেতর থেকে।

ক্রালারের আপিস থেকে কয়লাগাদার পাশ দিয়ে একটা লম্বা দালানপথ চলে গেছে; তার শেষে চার ধাপ উঠলে গোটা বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে জমকালো ঘর: দপ্তরের খাসকামরা। গাঢ় রঙের ভব্যিযুক্ত আসবাব, লিনোনিয়াম আর কার্পেট বিছানো মেঝে, রেডিও, ঝকঝকে বাতি। সবই প্রথম শ্রেণির। এর ঠিক গায়েই বেশ বড়সড় একটা রান্নাঘর, তাতে গরম জলের কল আর গ্যাসের উনুন। পাশেই বাথরুম। এই নিয়ে হলো দোতলা।

নিচেকার দালানপথ থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে উপরতলা (খ)। উপরে উঠে গেলে একটা ছোটো যাতায়াতের পথ। তার দুদিকে দুটো দরজা। বাঁদিকের দরজা দিয়ে বাড়ির সামনের অংশে মালগুদামে যাওয়া যায়, অন্যটা দিয়ে যাওয়া যায় চিলেকোঠায়। ওলন্দাজদের সিঁড়িগুলো হয় বেজায় খাড়া– তারই একটা দিয়ে নেমে গিয়ে নিচের দরজা খুললেই রাস্তা (গ)।

ডানহাতি দরজাটা দিয়ে আমাদের 'গুপ্ত মহল'টাতে যেতে হয়। বাইরে থেকে দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না যে সাদামাটা ছাই-রঙা দরজাটার ঠিক আড়ালেই এতগুলো ঘর রয়েছে। দরজার সামনে একটা পৈঁঠে, সেটা পেরোলেই অন্দরমহল।

প্রবেশপথের ঠিক সামনা-সামনি একটা খাড়া সিঁড়ি (ঘ)। বাঁদিকের ছোটো গলিটা দিয়ে এগোলে একটা ঘর, সেটা হলো ফ্রাঙ্ক-পরিবারের শোয়া-বসার ঘর। ডানদিকের জানলাহীন ছোটো ঘরটাতে এক পাশে বেসিন লাগানো জলের কল আর অন্য পাশে পায়খানা খোপ। অন্য দরজা দিয়ে গেলে মারগট আর আমার ঘর। এর পরের সিঁড়িটা দিয়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে তোমার তাক লেগে যাবে। ক্যানেলের পাশে এরকম একটা সেকেলে বাড়িতে আলোয় ঝলমল কী প্রকান্ড ঘর। ঘরটার একপাশে একটা গ্যাসের উনুন আর একটা হাত ধোয়ার জায়গা (আগে এটা ল্যাবোরেটরি হিসাবে ব্যবহার হতো কি না)। এখন এটা ফান দম্পত্তির রান্নাঘর; তাছাড়া সাধারণভাবে সকলেরই বসার ঘর, খাওয়ার ঘর এবং বাসন মাজার জায়গা।

একটা ছোটো এইটুকু দালানঘর হবে পিটার ফান ডানের বাসস্থান। আর নিচের তলায় ল্যান্ডিংটার মতোই রয়েছে বিরাট একটা চিলেকোঠা। এখন তাহলে গোটা ব্যাপারটা বুঝলে। আমাদের ভারি সুন্দর গোটা 'গুপ্ত মহল'টার সঙ্গে তোমাকে আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

তোমার আনা

শুক্রবার, জুলাই ১০, ১৯৪২

আদরের কিটি

আমাদের বাসস্থানের প্যাঁচানো লম্বা ফিরিস্তি পড়ে তুমি নিশ্চয় তিক্তবিরক্ত। কিন্তু তবু আমি মনে করি যে, আমরা কোথায় এসে ঠেকেছি সেটা তোমার জানা উচিত।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম– দেখছ তো, এখনও আমার কথা শেষ হয়নি– প্রিন্সেনগ্রাখটে যখন আমরা এসে পৌঁছুলাম, মিপ্ তাড়াতাড়ি আমাদের ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে 'গুপ্ত মহলে' তুললেন। মিপ্ দরজা বন্ধ করে দিতেই আমরা একা হয়ে গেলাম। মারগাট সাইকেল চালিয়ে ঢের তাড়াতাড়ি এসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের বসবার ঘর আর অন্যান্য সমস্ত ঘরই ছিল অকথ্যভাবে রাবিশে ভর্তি। আগের মাসগুলোতে আপিসে যত কার্ডবোর্ডের বাক্স এসেছে, সবই হয় মেঝেতে, নয় বিছানার ওপর স্তূপাকার হয়ে আছে। ছোটো ঘরটার মট্‌কা অব্দি বিছানার চাদরে কাপড়ে ঠাসা। আমরা দেখলাম, সে রাতে ভদ্রগোছের বিছানায় যদি শুতে হয় তাহলে তক্ষুণি সব সাফসুফ করা দরকার। আমরা সে কাজ শুরু করে দিলাম। মা আর মারগটের কিছু করবার অবস্থা ছিল না; ওরা এত ক্লান্ত যে বিছানায় নেতিয়ে পড়েছিল, মন খারাপ হওয়া ছাড়াও আরও অনেক কিছু ছিল। পরিবারের দুই–'ধাওড়'– আমি আর বাপি– আমরা তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করে দিতে চাইলাম।

দম ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সারাদিন ধরে আমরা বাক্স থেকে জিনিস বার করলাম, তাকগুলোতে ভরলাম, হাতুড়ি ঠুকলাম আর গোছগাছ করলাম। তারপর সে রাত্তিরে পরিষ্কার বিছানার ওপর লম্বা হলাম। সারাটা দিন আমরা দাঁতে কুটো কাটিনি, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায়নি। মা আর মারগট এমন নেতিয়ে পড়েছিল যে, তাদের খাওয়ার মতো মনমেজাজই ছিল না। অন্যদিকে বাবা আর আমি খাওয়ার কোনো ফুরসতই পাইনি।

মঙ্গলবার সকালে আমরা তার আগের দিনের কাজের জের টানতে লাগলাম। এলি আর মিপ্ আমাদের হয়ে রেশন তুলে এনে দিলেন। বাবা মন দিলেন বাইরে আলো না যাওয়ার ব্যবস্থাটাকে আরও পাকাপোক্ত করতে। আমরা রান্নাঘরের মেঝে থেকে ঘষে ঘষে ময়লা তুললাম। সেদিনও সারাদিন ধরে আমাদের এইসব চলল। আমার জীবনে এতো বড়ো একটা ওলট-পালট হয়ে গেল, বুধবারের আগে তা নিয়ে ভাববার কোনো সময়ই পাইনি। এখানে আসবার পর সেই প্রথম আমি জো পেলাম তোমাকে সব কিছু জানাবার আর সেই সঙ্গে এ বিষয়ে নিজেও ঠিকঠাক বোঝাবার যে, আমার জীবনযাত্রার আদতে কী ঘটে গেছে এবং এর পরেও কী ঘটতে যাচ্ছে।

তোমার আনা

[আনা ফ্রাঙ্ক (১২ জুন ১৯২৯–মার্চ ১৯৪৫) ধর্মে ছিলেন ইহুদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩৩ সালে আনা যখন চার বছর বয়সের শিশু তখন আনা, তার বড়ো বোন মারগটসহ পুরো পরিবার হল্যান্ডে বসবাস করা শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সপরিবারে তারা একটি গোপন আস্তানায় আশ্রয় নেন। সেই বন্ধ ঘরের বিমর্ষ দিনগুলো এবং নৎসিদের অত্যাচার আনা লিপিবন্ধ করে গেছেন তার ডায়েরিতে।]

৫. হিটলারের ডায়েরি

অ্যাডল্‌ফ হিটলার

মার্চ ১৯১৭

কুঁড়েগুলো পালিয়েছে। কিন্তু এই কুঁড়ের দল কারা? কারা আবার? ইহুদিরা। প্রায় সব কেরানিই হলো ইহুদি; আর ইহুদি মাত্রই কেরানি। ইহুদিরা সমস্ত জাতির সুখ, ঐশ্বর্য আর সৌভাগ্যকে হরণ করেছে এবং জার্মান জাতিকে পরাধীন করে পদানত করে রেখেছে।

২৮শে জুলাই ১৯২২

ইহুদিরা কোনোদিন কোনো সভ্যতার পত্তন করেনি; বরং শয়ে শয়ে সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে সংক্রামক ব্যাধির মতো। ইতোমধ্যেই ইহুদিরা রাশিয়াকে ধ্বংস করেছে; এইবার জার্মানির পালা। ওদের রক্তের মধ্যে ধ্বংসের বীজ নিহিত। জাতির খাঁটি রক্তে নিজেদের দূষিত রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জাতির শক্তিকে বিনষ্ট করাই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নভেম্বর ১৯২২

আমরা কিছুতেই এমন এক সরকারের কাছে মাথা নত করব না, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতারণায় গঠিত। আমরা একনায়কতন্ত্র চাই।

৮ই নভেম্বর ১৯২৩

নভেম্বরের অপরাধীদের ছুড়ে ফেলে দেওয়া পর্যন্ত অন্য কিছু ভাবনা-চিন্তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আজকের বিধ্বস্ত জার্মানির ওপরেই গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী এক মহান জার্মানি।

ফেব্রুয়ারি ১৯২৪

১৯১৮ সালের বিশ্বাসঘাতকের প্রতি যেকোনো রকমের বিশ্বাসঘাতকতাই বিশ্বাস ভঙ্গ নয়; এমন দিন আসবে যখন এই টুকরো টুকরো দল একত্র হয়ে ব্যাটেলিয়ান হবে। তারপর সেই ব্যাটেলিয়ানগুলোই হয়ে দাঁড়াবে পুরো একটা রেজিমেন্ট। রেজিমেন্টগুলো দিনে দিনে ডিভিশনে পরিণত হবে। পুরোনো টুপির ফুল তোলা হবে কাদা থেকে, আর পুরোনো ফ্ল্যাগটা আবার পত্‌পত্‌ করে উড়বে নির্মেঘ জার্মানির আকাশের বুকে।

গ্রীষ্মকাল ১৯২৪

যুদ্ধে পরাজয় মানে একটা জাতির অবলুপ্তি নয়। কারণ প্রতিরোধ ক্ষমতাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, যা একমাত্র খাঁটি রক্তে মানুষদের মধ্যে বর্তমান। এই পৃথিবীতে যারা উচ্চ বংশজাত নয়, তারা পরিত্যক্ত ভুসির শামিল। জার্মানিরা হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি।

৬. দুর্দিনের দিনলিপি

আবুল ফজল

বিজয়ের দিনলিপি ১৯৭১

১৭.১২.১৯৭১। চট্টগ্রাম

এর মধ্যে খবর সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেছে। দেশ এখন স্বাধীন। সারাদেশ উল্লাসিত। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সবাই ফেটে পড়েছে বাঁধভাঙা আনন্দে। বন্ধুরা ছুটে এসেছেন দেখা করতে। বাঁশবাড়িয়ার এককালের জমিদার– নন্দন বিনোদ চৌধুরী দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। সে কান্নায় মিশে আছে বেদনা আর আনন্দ। তাঁর নিকট আত্মীয়দের কাকে কাকেও মেরে ফেলা হয়েছে, তাঁর ঘর-বাড়ি এখনো অন্যের দখলে।

তরুণ বুদ্ধিজীবীরা ছুটে এসে বললে মিছিল করতে হবে, বিজয় মিছিল। দেরি করা যাবে না। আজ বিকেলেই। তথাস্তু। ওরাই ঠিক করল। আমার এখানে এসেই জমায়েত হবে সবাই। সাহিত্য নিকেতন থেকেই শুরু হবে মিছিল। মুখে মুখে ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল সেভাবে। বিকেল হতে হতে বিপুল ছাত্র-জনতা এসে জড়ো হলো সাহিত্য নিকেতনের সামনে। কোথা থেকে শতাধিক মেয়ে এসেও জুটল। হঠাৎ স্নেহভাজন বখতেয়ার নূর সিদ্দিকী এসে বলল, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এসে পড়েছে, ওরাও মিছিলে শরিক হতে চায় সশস্ত্র অবস্থায়। আপনার অনুমতির অপেক্ষায়। নয় মাস পরে ওর সঙ্গে দেখা। জড়িয়ে ধরে বললাম। নিশ্চয়, আমার সানন্দ সম্মতি রয়েছে।

কয়েক শ তরুণ মুক্তিযোদ্ধা মিশে গেল আমাদের মিছিলে। ওদের কাঁধে রাইফেল, পরনে ইউনিফর্ম। এর মধ্যে মিছিল এত দীর্ঘ হয়ে গেছে যে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যায় না। সাহিত্য নিকেতন থেকে শুরু হলো মিছিলের পদযাত্রা। এনায়েত বাজার হয়ে স্টেশন ঘুরে নিউ মার্কেটের সামনে যখন পৌঁছেছি তখন দাবি উঠল বক্তৃতা দেওয়ার। মাইকে দু-চার কথা বললাম। অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আর তরুণ কর্মী মাহবুবুল হক এবং আরও কেউ কেউ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে মাইক প্রায় ফাটিয়ে ফেলল। এরপর জেনারেল পোস্ট অফিস আর স্টেট ব্যাংকের সামনে দিয়ে লালদিঘির ময়দানে এসে যখন পৌঁছেছি তখন বিরাট এক গণজমায়েতের মাঝখানে আমরা।

ময়দান ভর্তি জনতা। রাস্তা আর পাহাড়ের ঢালুতেও তিল ধারনের জায়গা নেই। তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা খুশির চোটে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে প্রকাশ করতে লাগল ওদের অদম্য উল্লাস। এর মধ্যে কে বা কারা মাইক এনে আমার সামনে দিয়েছে খাড়া করে। বেশি করে বলতে হলো শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। সেই সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুজির নগরে গৃহীত রাষ্ট্রীয় চার নীতির কথাও।

[আবুল ফজলের 'দুর্দিনের দিনলিপি' থেকে সংকলিত]

৭. একাত্তরের ডায়েরি

সুফিয়া কামাল

১২ ডিসেম্বর, রবিবার, ১৯৭১

রাত ১০টা

গতকাল বেলা ৩টা থেকে ঢাকায় কারফিউ দেওয়া হয়েছে, আজ পর্যন্ত চলেছে। আজ ৩ দিন ৩ রাত শামীম বাড়িতে আর আসতে পারেনি। আজ রয়াল এয়ারফোর্স এসে ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাস কর্মচারী পরিবার ঢাকা থেকে নিয়ে গেল। প্লেন থেকে গোলাবর্ষণ, তথাকথিত ভারতীয় গোলাবর্ষণ হচ্ছে মাঝে মাঝে। ঢাকার বাড়িঘর অধিকাংশ শূন্য। ভয়াবহ নীরবতা আতঙ্ক আশঙ্কায় মানুষ শ্বাস রোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে দিনরাত কাটাচ্ছে। আমার ভয় নেই শঙ্কা নেই। আল্লাহ আছে। চাটগাঁ বিচ্ছিন্ন। কোথাও থেকে কারুর কোনো খবর পাচ্ছি না। ফোনও মৃত।

১৪ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী ঢাকার কাছে এসেছে। আজ ৩ দিন থেকে ঢাকায় কারফিউ, হাট-বাজার বন্ধ। আজ পানিও নেই। নিস্প্রদীপ তো আছেই। আশা করছি রাত যত গভীর হচ্ছে, ভোরের আলো ততই এগিয়ে আসছে। জয় হোক সর্বহারাদের। যুদ্ধ বিরতির আলোচনা শুরু হয়েছে। শ্রীমতি গান্ধীর বাংলাদেশ স্বীকৃতি দানের পর শত্রুপক্ষের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়েছে। ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ। মায়ের দুধ খেয়েছিল। এ সুকন্যা। আজ আশায় গৌরবে বুক ভরে উঠছে, সব হারিয়েও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অনেক বড়ো। আল্লাহ যেন এ আশায় বাধ না সাধেন। ওগো অকরুণ দাতা। অনেক দিয়েছ, অনেক নিয়েছ। বাংলাদেশের আজাদী দাও এবার।

১৫ ডিসেম্বর, বুধবার, ১৯৭১

আজ ৬ মাস হলো, আমার পাখিরা আমার কোলছাড়া। আল্লাহ নেগাহ্বানী করছেন। সর্ব দুঃখের দাহন নিয়ে আজও আল্লাহর কাছেই আবার মাথা নোয়াই। ফিরে আসুক বাংলার বুকে শান্তি। আসুক ফিরে মুজিব। আসুক যার যার বুকের ধনেরা যারা আজও বেঁচে আছে তারা মায়ের কোলে। আমার বাছারাও যেন ফিরে আসে। জোর দিতে ভারত যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিচ্ছে। সন্ধ্যা ৫টা থেকে আগামীকাল সকাল ৯টা পর্যন্ত সময় নির্ধারিত হয়েছে। সোভিয়েত থেকে জোর হুমকি চলছে, আল্লাহ যেন এবার রহমত করেন।

১৬ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৯৭১

আজ ১২টায় বাংলাদেশ যুদ্ধ বিরতির পর মুক্তিফৌজ ঢাকার পথে পথে এসে আবার সোচ্চার হলো 'জয় বাংলা' উচ্চারণে। আল্লাহর কাছে শোকর। বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতি কমে গেছে যেন, তবুও একি শিহরণ। আল্লাহ! তোমার দানের অন্ত নেই। ইন্দিরা গান্ধী শতায়ু হোন। শতবার কৃতজ্ঞতা জানিয়েও তার ঋণ শোধ হবে না। জয়যুক্ত হোক সোভিয়েত রিপাবলিক। আমার বাবা আমার কাহ্হার আজ বেঁচে নেই। আজ ২৯ দিন হলো, সে শুয়ে আছে মাটির কোলে। আর আজ কি শোকাবহ ঘটনা। জয় মিছিল দেখতে গিয়ে হাতেম আলীর শালীর মেয়ে জলির বড়ো বোন ডলি ১৮নং রাস্তায় গিয়ে মিলিটারির উন্মত্ততার দরুন গুলিতে মারা গেল। আহা! মা বেঁচে আছে যে। এ যে কি করুণ দৃশ্য।

৮. দিনলিপি

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২রা আগস্ট ১৯৪৩। ১৬ই শ্রাবণ ১৩৫০। সোমবার

সকালে উঠে লিখতে বসি 'মৌচাক' ও ছোটোগল্প। স্নান করে এলুম ঘোলার গাঙে– বেশ রোদ। কিন্তু যখন নেমে এলুম, তখন বেশ মেঘ করে এলো। বিকেলে বেশ রোদ, মরাগাঙের ধারে বেড়াতে গেলুম। ইন্দু রায়, হর প্রভৃতি মাছ ধরছে। বড়ো সুন্দর ওপারের আরামডাঙার দৃশ্য– নীল আকাশের বড়োই অদ্ভুত শোভা।

[প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণের মনোজগত ও দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে তাঁর দিনলিপিতে।]

৯. প্রবাসের দিনলিপি

জাহানারা ইমাম

৫ জুলাই ১৯৯১

গতকাল আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হলো। এই দিনে সারা দেশজুড়ো সর্বত্রই প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে স্বাধীনতা দিবসের নানারকম অনুষ্ঠান; বিশেষ করে, ফোর্থ অব জুলাই প্যারেড হয়। সে প্যারেডে সরকারি-বেসরকারি সকলেই অংশগ্রহণ করে। আর হয়, রাত্রিবেলা ফায়ারওয়ার্কস-আতশবাজি। আমরা গতকাল সারাদিন কাটিয়েছি ক্রসরোড ভিলেজে। ক্রসরোড ভিলেজ ও হাকলবেরী রেইলরোড এই নামের জায়গাটি আসলে টুরিস্ট আকর্ষণ। ১৯৭৬ সালের ৪ জুলাই আমেরিকান স্বাধীনতার দ্বিশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের দিনে এই ভিলেজটির উদ্‌বোধন করা হয়। পুরো ভিলেজটিকে ১৮০০ সালের মাঝামাঝি সময়ের এক গ্রামের আদলে বানানো হয়েছে।

আমেরিকানরা সবসময় যে জিনিসটার অভাব বোধ করে, তা হলো ঐতিহ্য (tradition)। তাদের ইতিহাসের বয়স মাত্র ২০০ বছর (সঠিকভাবে বলতে গেলে ২১৫ বছর)। দু'শ বছর আগে তারা একটা নতুন মহাদেশে পদার্পণ করে, সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু রেডইন্ডিয়ান বসতি ছাড়া বাকি পুরো জায়গাটাই ঘোর জঙ্গল, বিরাট পাহাড়, হাহা মরুভূমি আর খরস্রোতা নদী ছাড়া আর কিছু ছিল না। সেই বন-জঙ্গল-পাহাড় কেটে উদ্দাম নদীকে বশে এনে তারা ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করে এবং এই বর্তমানের যুক্তরাষ্ট্রকে গড়ে তোলে। স্বভাবতই তাদের পূর্ব বাসভূমি ইয়োরোপের বহুশতাব্দী ধরে গড়ে উঠা প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি সবসময়ই মনে পড়ে। তবে আমেরিকানরা কোনো কিছুতেই দমে না। ঐতিহ্য নেই তো কি হয়েছে। ঐতিহ্য গড়ে নেব। তাই, তারা এখন তাদের দু'শ বছরের পুরোনো জিনিসগুলোকেই ঐতিহ্যের মর্যাদা দিয়ে লালন করে থাকে। সারাদেশেই সর্বত্রই এই প্রবণতা। ক্রসরোড ভিলেজ ও হাকলবেরী রেইলরোড তার একটি নমুনা।

ক্রসরোড ভিলেজের বাড়িঘরগুলো আসলেই উনিশ শতকের শেষের দিকের তৈরি পুরনো বাড়ি। সেগুলো নষ্ট হতে না দিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে তুলে এনে ভিলেজে বসানো হয়েছে এবং ঠিক ১৮৬০–৭০ দশকের স্টাইল এবং ডিজাইন রক্ষা করে ওগুলোর পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ (renovation and preservation) করা হয়েছে। ভিলেজে ঢোকার মুখে পাশাপাশি চারটে গেটে লোক বসে থাকে, টিকেট দেখে ভিতরে ঢোকানোর জন্য। ভিতরে ঢুকেই দেখা যায় এক চমকপ্রদ দৃশ্য। উনবিংশ শতাব্দীর স্টাইলের পোশাক পরে নারী-পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা এই ভিলেজের কর্মচারীবৃন্দ। মেয়েদের পরনে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা লেস ও ঝালর লাগানো গাউন, মাথায় ফ্যান্সি হ্যাট, পুরুষদের পরনে সে যুগের স্টাইল ও ছাঁট অনুযায়ী প্যান্ট, শার্ট ও কোট। মাথায় লম্বা টুপী। যেমনটি আমরা সিনেমায় দেখে থাকি। সৈনিকের পোশাক পরা কিছু লোকও দেখা গেল তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বন্দুকধারী সৈনিকেরও অভাব দেখলাম না। দোকান-পাট, বাড়িঘর, ছাপাখানা, কামারশালা, তাঁত-ঘর, উকিলের অফিস, আদালত, কাঠচেরাইয়ের দোকান, বন্দুকের দোকান, ব্যাংক, পোস্টাপিস, ডাক্তারখানা– কী নেই সেখানে। সবই পুরোনো ধাঁচের তৈরি, ভিতরের কাজ-কারবারও দেড়'শ বছর আগের পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। যাতে টুরিস্টরা দেখে বুঝতে পারেন– সেকালের জীবন-যাপন প্রণালি কী রকম ছিল।

আমার সবচেয়ে ভালো লাগল ট্রেন-ভ্রমণের ৩৫ মিনিট। হাকলবেরী রেইলরোড ৮ মাইল ব্যাপী জায়গার মধ্যে ৩৫ মিনিটে একবার ঘুরিয়ে আনে। রেলগাড়িটি আদি ও অকৃত্রিম দেড়'শ বছর আগের বানানো, সেই আগের মতোই কয়লা পুড়িয়ে তৈরি বাষ্প-চালিত। রেল রাস্তায় দু'পাশে দেখা গেল ছুটন্ত বনজঙ্গল, নদী, খাল, গ্রামের বাড়ি, ঘর। অর্থাৎ সত্যিকার রেল ভ্রমণে যেসব দৃশ্য দু'শ-চার'শ মাইলে দেখা সম্ভব, সেগুলি এই ৮ মাইলের মধ্যেই আঁটানো হয়েছে। পু-ঝিকঝিক শব্দ তুলে হেলেদুলে রেলগাড়ি চলে, মাঝে মাঝে জোরে হুইসল বাজে, ভসভস করে সাদা ধোঁয়া বেরিয়ে ক্ষণকালের জন্য দু'পাশ আচ্ছন্ন করে দেয়।

এছাড়াও আছে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে করে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ানো। সেটায় আমরা আর চড়িনি। এখানে একটি ওপেরা-হাউস আছে। সেখানে প্রতি ঘণ্টায় একটা করে শো হচ্ছে। আমরা দুটোর শোতে ঢুকলাম। এটা অনেকটা বিচিত্রানুষ্ঠান ধরনের শো। গান, নাচ, চুটকি, কৌতুক পরিবেশন সবরকম আছে। সবই সেকালের পোশাকে এবং সেকালের স্ট্যান্ডার্ডে।

তিনটের সময় ফোর্থ অব জুলাই প্যারেড শুরু হবে। রাস্তায় দু'পাশে লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে। আমরাও সুবিধে মতো একটা জায়গায় দাঁড়ালাম।

কোথা থেকে যেন মাইকে ধারা বিবরণী দেওয়া হচ্ছে। চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মাইক দেখতে পেলাম না, পরে জামী বলল, যেখান থেকে প্যারেড শুরু হয়েছে তার কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে ঘোষণা করছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার থেকে বেশখানিকটা দূরে।

প্যারেডে সমাজ জীবনের সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। সরকারি পর্যায়ে মেয়র থেকে শুরু করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে নানা পোশাকে সজ্জিত মানুষ প্যারেড করে এগিয়ে গেল, সেনাবাহিনীর লোকও ছিল, ঘোড়সওয়ার ছিল; আর ছিল নানা মডেলের, নানা আকারের মোটর গাড়ি, জিপ, ট্রাক। মোটরগাড়ি তৈরির প্রথম যুগের কয়েকটা গাড়ি দেখে খুব মজা লাগল। প্যারেডে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ সবাইকে খুব আনন্দ দিয়েছে। এক সময় দেখা গেল, ভিয়েতনাম যুদ্ধফেরত কয়েকজন প্রাক্তন সৈনিক (vietman veterans of America) মার্চ করে এগিয়ে আসছেন। তাঁরা আমাদের সামনে দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, কয়েকজনের জামার পেছনে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে, Missing but not forgotten in South East Asia দেখা মাত্র আমার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ল। উনিশ শতকের এক গ্রামে সারাটা দিন কাটিয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম ছ'টার দিকে।

ক্রসরোড ভিলেজের জনতার মধ্যে একটা জিনিস খুব চোখে পড়েছে। তা'হলো প্রচুর মোটা মানুষ। আমেরিকায় মোটা মানুষের সংখ্যা প্রচুর এতদিন কেবল কাগজে-পত্রিকায় পড়েই এসেছি। মোটা মানুষও প্রায় প্রায়ই চোখে পড়েছে তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে। একজন দুজন করে। এখানে সেখানে। কিন্তু একসঙ্গে এত মোটা পুরুষ, মহিলা এবং কিশোর এই প্রথম দেখলাম।

১০. জীবনস্মৃতি: বাহিরে যাত্রা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারাবনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিন্তু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ারভাঁটার আসা যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণিবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায়গ্রহণ করে; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলোর মধ্যে যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। সকালবেলায় এখোগুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে-অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই রসবোধের মধ্যেই আছে– এইজন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।

যেখানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ঘাট-বাঁধানো একটা খিড়কির পুকুর– ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামরুলগাছ; চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আবরু রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া-করা, সংকুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর কতই তফাত। এ যেন ঘরের বধূ। কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লতাপাতা-আঁকা সবুজরঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহ্নের নিভৃত অবকাশে মনের কথাটিকে মৃদু্যগুঞ্জনে ব্যক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহ্নেই অনেক দিন জামরুলগাছের ছায়ায়, ঘাটে একলা বসিয়া পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি, চণ্ডীমণ্ডপ, রাস্তাঘাট, খেলাধুলা, হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল– কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে– পায়ের শিকল কাটিল না।

একদিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুইজনে সকালে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে ঘনবনের ছায়ায় শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়ো আনন্দে এই ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিতেছিল, তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমার অগ্রবর্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন, আমি পিছনে আছি। তখনই ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, 'যাও যাও, এখনি ফিরে যাও।'– তাঁহাদের মনে হইয়াছিল বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য-কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই– ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাকপরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনা-ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং সে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত, ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সে হয়তো আজ চল্লিশ বছরের কথা। তারপরে সেই বাগানের পুষ্পিত চাঁপাতলার স্নানের ঘাটে আর একদিনের জন্যও পদার্পণ করি নাই। সেই গাছপালা, সেই বাড়িঘর নিশ্চয়ই এখনো আছে, কিন্তু জানি সে বাগান আর নাই; কেননা, বাগান তো গাছপালা দিয়া তৈরি নয়, একটি বালকের নববিস্ময়ের আনন্দ দিয়া সে গড়া-সেই নববিস্ময়টি এখন কোথায় পাওয়া যাইবে?

SINCE - 1993
NABARUN PUBLICATION